একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158
ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)
An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

The Position of Three Maiden Women in love and Life in the 'Mymensingh Gitika'

'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় প্রেম ও জীবনে তিন কুমারী নারীর অবস্থান

Name of the Author: Prova Biswas
Affiliation: Research Scholar, Bengali Department,
The University of Burdwan, West Bengal, India.

Abstract: Love is identified as the primary and most fundamental theme underpinning the ballads of the 'Mymensingh Gitika'. Although the subject of love remains constant, the paths it traverses and the ends it seeks are not uniform; in some instances, it manifests as a comedy of reunion, while in others, it unfolds as a tragedy of separation. The central focus of this essay is the role and status of three young women—three maidens—within the realms of love and life. These three women are Mahua from the 'Mahua' ballad, Chandravati from the 'Chandravati' ballad, and Lila from the 'Kanka o Lila' ballad. All three of these ballads depict the poignant consequences of love. In the tragic denouements of these three love ballads, the heroines ultimately meet their deaths. Only Chandravati survives at the conclusion of her tale; yet, her survival is akin to that of a living corpse. Mahua's death is precipitated by the collective interests of her nomadic 'Bede' community. Although Mahua valiantly struggled against adversity for the sake of her love, a tender soul brimming with immense potential was ultimately extinguished. In the lives of Kanka and Lila, it is societal strictures that stand as obstacles in the path of love; at the root of this conflict lie the decrees of an orthodox Brahmin and the misguided beliefs of their spiritual mentor, Guru Garga. In the context of the medieval era, these three women demonstrated heroism—not merely of the spirit, but of both body and mind—thereby attaining the exalted stature of heroic women. Despite facing humiliation at the hands of religious dogma, societal norms, and moral codes regarding their clandestine romances, they successfully carved out distinct identities for themselves as women of exceptional individuality. While the tragic outcomes in the lives of Mahua, Chandravati and Lila undoubtedly rendered their pursuit of independent love—and their very right to love—vulnerable and helpless, their love was nonetheless elevated to a transcendent new plane.

Keywords: Idiosyncrasy, Celibate, Love, Renunciation ,Society, Mahuya, Chandravati, Lila.

‘মৈমনসিংহ গীতিকা’য় প্রেম ও জীবনে তিন কুমারী নারীর অবস্থান

প্রভা বিশ্বাস

বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রে একছত্র অধিপতি পুরুষেরাই। তা সত্ত্বেও বাংলার সমাজজীবনে, বাঙালির গৃহজীবনে ও সাহিত্যের বিষয় হিসেবে নারীরা আলোচিত হয়েছে। কারণ পুরুষের প্রেরণা ও শক্তি হল নারী। আর নারীর শক্তি তার প্রেমের ক্ষেত্রে। এই প্রেমেই নারীর হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু মধ্যযুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কী নারীর প্রেমকে স্বীকার করে নিয়েছিল? না নেয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য— “সেকালের জীবন-ব্যবস্থায় মানুষ হিসেবে নারীর কোনো মর্যাদাই ছিল না; নারীর মূল্য সেদিন নির্ণীত হয়েছে তার সতীত্বের সমাজ আরোপিত মূল্যের মাপকাঠিতে।”[১]

এখান থেকে একথা স্পষ্ট যে, তৎকালীন পুরুষতন্ত্র নারীর চিন্তা-ভাবনাকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করেছে তেমনি স্থির করে দিয়েছে তার কর্তব্য-কর্মকে। দেববাদ নির্ভর প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাই নারীর স্বাধীন প্রেমের কোনো অবকাশ ছিল না বললেই হয়। দেব-দেবী নির্ভর আখ্যানকাব্যের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রায় সব নর-নারীর সম্পর্ক দাম্পত্য প্রেমের আদর্শে নিষ্ঠা-নিবিড়তায়, আনুগত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেখানে বিবাহ-বন্ধন বহির্ভুত প্রেম ছিল অনেকটা নিষিদ্ধ ফলের মতো বা বলা যেতে পারে—

> “নারীর সতীত্ব নামক গুণের (Property) ওপরে বিশ শতকের পূর্ববর্তীকালে অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে; কারণ পুরুষের প্রয়োজনে বিশেষ করে মধ্যযুগের স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য পুরুষ প্রধান জীবন-যাত্রার স্বার্থরক্ষার জন্য নারীকে জননী-জায়া-কন্যার সামাজিক মূল্যের গণ্ডিতে বদ্ধ করে রাখার প্রাণান্ত প্রয়াস চলেছে।”[২]

কিন্তু মধ্যযুগের শেষভাগে রচিত ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র নারী চরিত্রগুলি কেবল সতীত্ব বা মাতৃত্বের গৌরবে বন্দী নয়, বরং তারা প্রেমের শক্তিতে পরিবার বা সমাজগণ্ডির পিঁজরা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। মধ্যযুগের বেশিরভাগ চরিত্রই যেখানে দৈবী লীলায় চালিত সেখানে গীতিকার নারী চরিত্র মহুয়া, চন্দ্রাবতী ও লীলার প্রেম পুরোহিত শাসিত বা সমাজ নিয়ন্ত্রিত প্রেম নয়, তা স্বাধীন হৃদয়ের প্রকাশ। এই স্বাতন্ত্র্য তাদের প্রাক্-বিবাহ প্রেম ও জীবন ভাবনার মধ্যেই নিহিত।

‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র পালাগুলির প্রত্যেকটির মূলে রয়েছে নারীর লৌকিক প্রেম। প্রত্যেকটি পালা যে নারী প্রধান তা পালাগুলির নামগুলি থেকেই স্পষ্ট। নায়িকারা আপন আপন প্রণয়ী নির্বাচনে স্বাধীন মনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। আমরা জানি যে, প্রাচীন যুগে উচ্চবিত্ত পরিবারে স্বয়ংবরসভার আয়োজন করা হত কন্যা কর্তৃক স্বাধীনভাবে পতি নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে। এই প্রথার সঙ্গে ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র নারী চরিত্রের স্বাধীনভাবে পতি বা স্বামী নির্বাচনের মৌলিক ব্যবধান প্রসঙ্গে আজিজুল হকের মন্তব্য এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী কাঠামোর মধ্যে এই নির্বাচন সীমাবদ্ধ ছিল। রাজকন্যাগণকে স্বশ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণের মধ্যেই কাউকে বরমাল্য পরাতে হতো। পতি নির্বাচনে স্বাধীনতার অর্থ ছিল আভিজাত্য ও শ্রেণী অহংকার অক্ষুণ্ণ রেখেই স্বাধীনতা ভোগ। স্বয়ংবর সভার শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রগুলি তাদের পতি নির্বাচনে শ্রেণী নিরপেক্ষ স্বাধীনতার প্রমাণ দিয়েছে।"[৩]

আমরা দেখেছি মহুয়া চরিত্রটিকে, বেদে হিসেবে যার পরিচিতি। সে ব্রাহ্মণ নদেরচাঁদকে স্বামী বলে স্বীকার করে নিয়েছে। অন্যদিকে, চন্দ্রাবতী আবাল্য সাথী জয়ানন্দের প্রণয়ভাজন আর লীলা চণ্ডাল পালিত কঙ্কের প্রতি অনুরাগী হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন এই নারী চরিত্রের মধ্যে প্রেমের উদ্ভাবনী শক্তি প্রত্যক্ষ করে বলেছেন—

"এই গীতিকাগুলির নারী চরিত্রসমূহ প্রেমের দুর্জয় শক্তি ; আত্মমর্যাদার অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবন্তভাবে দেখাইতেছে । নারী প্রকৃতি মন্ত্র মুখস্ত করিয়া বড় হয় নাই, চিরকাল প্রেমে বড় হইয়াছে।"[৪]

মধ্যযুগীয় সমাজে স্ত্রীরূপে , জননী রূপে যেখানে নারীরা জগতের প্রাণ সেখানে এই দুই রূপের বাইরে বিবাহের আগে তারা প্রণয়ীর প্রতি আত্মনিবেদন করেছেন । বলা যেতে পারে তারা আত্মনিবেদনের সুযোগ পেয়েছে। কারণ -

"এই সকল গীতিকার নায়ক -নায়িকাদের কাহারো বাল্যকালের প্রণয় হয় নাই । চোদ্দ, পনের এমনকি সতের বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েদিগকে অবিবাহিত দেখিতে পাইব।"[৫]

তৎকালীন যুগপটে যেখানে মেয়েদের দশ -বারো বছরেই মন ও মানসিকতা পূর্ণতা পাওয়ার আগে বিবাহ -বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়েছে সেখানে গীতিকার অন্যতম তিন নারী মহুয়া , চন্দ্রাবতী ও লীলা বিয়ের বয়স উত্তীর্ণ হয়েও অবিবাহিত এবং প্রাক্-বিবাহ জীবনে প্রেমের ক্ষেত্রে তারা তুলনাহীন দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

মহুয়া গাথার নায়িকা মহুয়া চরিত্রে আমরা দেখি প্রেমের নির্মল উচ্ছ্বাস ঘোষিত হয়েছে । পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন মহুয়া পালকপিতা হুমরা বেদের অনুশাসনে থেকেও পালঙ্গ সই-এর কাছে প্রণয়ী মনোনয়নে স্বাধীন অভিরুচির পরিচয় দিয়েছে এইভাবে—

"চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি।
নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী।।"[৬]

নদেরচাঁদকে দেখার পরেই সে তার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে তাকে স্বামী রূপে হৃদয়ে গ্রহণ করেছে । কিন্তু আমরা জানি, যে প্রেম বিবাহকে অস্বীকার করে সেখানে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্ন এসে যায় । কিন্তু মহুয়া তার প্রেমের পটভূমিতে সতীত্বকে অক্ষুন্ন রেখেছে । সে কখনো কামনা -বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি পুরোহিত বা

সামাজিক রীতি মেনে বিবাহ -বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি ঠিকই , কিন্তু মনে প্রাণে স্বীকৃতি দিয়েছে । তাই মহুয়ার প্রেম সম্পর্কে বলা যায়-

> "প্রেম যাহাকে জন্ম দিয়েছে ; প্রেম যাহাকে রক্ষা করিতেছে , তাহা ঋষিবচনের প্রতীক্ষা করে না। তাহা হিন্দু সমাজের নিজস্ব নহে , তাহা সমস্ত মানব -জাতির আরাধনার ধন । সমাজ তাহাকে রক্ষা করে না; সমাজকেই তাহা রক্ষা করে।"[৭]

স্বাধীন প্রণয়াকাঙক্ষার পাশাপাশি মহুয়া চরিত্রে আমরা ঐতিহ্য অনুগত বাঙালি নারীর সলাজ অনুভূতির পরিচয় পেয়েছি। মহুয়ার প্রতি প্রেমানুরাগে নদের চাঁদ গৃহত্যাগী হতে চেয়েছে ঠিকই কিন্তু মহুয়ার প্রেমানুভূতির কাতরতা থাকা সত্ত্বেও সে নিজের দুঃখের ভারে অন্যের জীবনকে অসুখী করতে চাইনি । সে নদেরচাঁদকে ঘরে ফিরে যেতে বলে, কুলমর্যাদা রক্ষার পরামর্শ দিয়েছে। তবে, কালক্রমে হুমরা বেদে তার হাতে ছুরি তুলে দিয়েছে নদেরচাঁদকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু ছুড়ির শাণিত ধারের মতোই মহুয়ার রোমান্টিক প্রেম ততোধিক গাঢ় হয়ে উঠেছে । তাই সে প্রেমকে বাঁচাতে গৃহত্যাগী হয়েছে, অনিশ্চিত জীবনকে বেছে নিয়েছে। এরপর থেকেই মহুয়া চরিত্রের সক্রিয়তা আমাদের হৃদয়কে আকর্ষণ করেছে । পথে নদী পারাপারের জন্য উভয়ে এক সওদাগরের শরণাপন্ন হলে সেই সওদাগর মহুয়ার দেহ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে নদেরচাঁদকে অতর্কিতে নদীর জলে নিক্ষেপ করে এবং মহুয়াকে প্রলোভন দেখায়। কিন্তু মহুয়া সমস্ত প্রলোভনকে উপেক্ষা করে বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সওদাগরকে সদলবলে নিহত করে। অর্থাৎ বলা যায়-

"সে যেমন মুনির মন ভুলানো অতুলনীয় দেহসৌন্দর্যের অধিকারিনী , তেমনি প্রখর বুদ্ধিমত্তাও তার চরিত্রের অন্যতম প্রধান গুণ।"[৮]

মহুয়া তার প্রণয় প্রাপ্তির মধ্যেই জীবনের যাবতীয় সুখ সন্ধান করেছে। তাই সওদাগর কর্তৃক নদের চাঁদের নদী জলে নিক্ষেপের পর বহু অনুসন্ধান করেও সে যখন নদের চাঁদের কোনো খোঁজ পায়নি তখনও সে নিজেকে হতপ্রভ হতে দেয়নি। কারন সে আশাবাদী-

> "না দিব না দিব পরাণ আরো দেখি শুনি।
> জঙ্গলার মধ্যে কার কাতর পরাণী।।"[৯]

অবশেষে ভাঙা মন্দিরের মধ্যে কঙ্কালসার নদেরচাঁদকে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু সেখানেও বিপদ উপস্থিত । মহুয়ার রূপলালসায় আসক্ত হয়েছে সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর লোলুপতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চলনশক্তিহীন নদেরচাঁদকে কাঁধে নিয়ে পলায়নপরতার মধ্যে মহুয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় মেলে । এছাড়া মহুয়ার প্রণয়ীর প্রতি বিশ্বস্ততার ও একনিষ্ঠতার পরিচয় জানা যায় , আবাল্য সাথী সুজন খেলোওয়ারের সাথে হুমরা বেদে তার বিয়ের প্রস্তাব করলে মহুয়ার দ্বিধাহীন প্রত্যাখ্যানের মধ্যে—

> "কেমন করি যাইবাম দেশে বন্ধুরে মারিয়া

তোমার সুজনে আমি না করবাম বিয়া।।
আমার বন্ধু চান্দ-সুরজ কাঞ্চা সোনা জ্বলে।
তাহার কাছে সুজন বাদ্যা জ্যোনি যেমন জ্বলে।।"[১০]

এই বিশ্বস্ততার উৎস যে প্রণয় প্রতিশ্রুতি এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না । প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকার এই অনুপ্রেরণা সামাজিক নীতি , আদর্শ পারলৌকিক ভীতি কিংবা ধর্মীয় অনুভূতি সঞ্জাত নয় । এই অনুপ্রেরণা ব্যক্তিজীবনকে মর্যাদা সম্পন্ন করে তোলার উপলব্ধি। মহুয়া তার প্রেমধর্ম রক্ষা করতে প্রণয়ীর সাথে পালিয়ে গিয়ে বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে। আর সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে একাই লড়াই করে গেছে । নিরদারুণ আবর্তের মধ্যে পড়ে নিজের বুদ্ধির দীপ্তিতে সে অন্ধকারে পথ খুঁজে পেয়েছে । শেষপর্যন্ত নিজের প্রেমকে এতটুকু নিষ্প্রভ হতে দেয়নি।

মহুয়া বহু সংকট পেরিয়ে আবেগময় উচ্ছ্বাসদীপ্ত মুক্ত জীবনের আনন্দ লাভ করেছে বনের মধ্যে । কিন্তু সেই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী আনন্দ। হুমরা বেদের পুনরায় আগমন তার বাঞ্ছিত সুখ থেকে বঞ্চিত করেছে। একদিকে পালক পিতার নির্দেশ আর অন্যদিকে প্রিয়তমের জীবন বাঁচাতে এবার সে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে । আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহুয়ার প্রেম ও দুঃখের তপস্যার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন-

"মহুয়ার প্রেম কি নির্ভীক আনন্দপূর্ণ। শ্রাবণের শতধারার ন্যায় দুঃখ আসিতেছে, কিন্তু এই প্রেমের মুক্তাহার কণ্ঠে পরিয়া মহুয়া চিরবিজয়ী , মৃত্যুকে বরণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছে।"[১১]

মহুয়ার দুরন্ত, দুর্বার প্রেম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে দিয়েছে।

গীতিকার আরেক অনূঢ়া প্রেমিকা নারী চন্দ্রাবতী। পিতা বংশীদাসের অনুশাসনে বেড়ে ওঠা চন্দ্রাবতীর প্রেম সহজপথে ব্যক্ত হয়নি। জয়ানন্দের প্রণয় নিবেদনের পূর্বে সে তার নিজের প্রণয়াকাঙ্ক্ষার কথা অব্যক্ত রেখেছিল । জয়ানন্দের কাছ থেকে প্রেমপত্র পাওয়ার পর সে নিজের প্রাণের কাহিনি ব্যক্ত করেছে 'ফুল তুলে জয়নানন্দ ভালোবাসি তারে' অর্থাৎ ছোটবেলা থেকেই চন্দ্র তাকে হৃদয় দান করেছে । তাই জয়ানন্দের প্রণয়ের কথা জানতে পেরে সে তার মনোভাব ব্যক্ত করেছে। সে পত্রের উত্তরে লিখেছে—

"চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী করি মনের দিকে চাইয়া।
জয়ানন্দ মাগে বর ধর্ম্ম সাক্ষী দিয়া।।"[১২]

জয়ানন্দ পত্রের উত্তর পেয়ে ঘটক পাঠিয়েছে। আর এরপরেই বিবাহ উদ্যোগের মধ্য দিয়ে চন্দ্রাবতীর মনের প্রণয় বাসনা চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ পায় । কিন্তু বিবাহের প্রাক্ -মুহূর্তে বিবাহ বন্ধনে প্রতিশ্রুত হয়েও জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর প্রেমকে উপেক্ষা করে মুসলিম কন্যার পাণিগ্রহণ করেছে । জয়ানন্দের এই অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণে চন্দ্রাবতী পাথরের মত নিশ্চুপ হয়ে যায় । তার জীবনে প্রেম পরিপূর্ণতা পাওয়ার আগেই শেষ হয়ে যায় ।

পিতা বংশীদাস নতুন করে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিতেই চন্দ্রাবতীর স্বকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে জীবন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। সে ভীষ্মের মতোই প্রতিজ্ঞা করে বলেছে—

"চন্দ্রাবতী বলে পিতা, মম বাক্য ধর।
জন্মে না করিব বিয়া রইব আইবর।।
শিব পূজা করি আমি শিবপদে মতি।
দুঃখিনীর কথা রাখ কর অনুমতি।।"[১৩]

বংশীদাসও চন্দ্রাবতীর কুমারী থাকার বাসনা মেনে নিয়েছেন। তারপর চন্দ্রাবতী পিতার আদেশে রামায়ণ রচনায় মনোনিবেশ করেছে। অর্থাৎ যন্ত্রণাদগ্ধ, প্রণয়লাঞ্ছিত, অপমানিত হৃদয়ে পিতৃ-আজ্ঞায় সে ধর্মনিষ্ঠা ও বিদ্যা চর্চার দ্বারা আত্মস্থ, পরিপূর্ণ নারীতে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে। বলা যেতে পারে, এই কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা সে তার প্রেমের বেদনা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করেছে । কিন্তু প্রেম বিস্তৃত হওয়ার এটা বোধহয় সঠিক উপায় ছিল না । কারণ জয়ানন্দের প্রতি তার দুর্বলতা সে কখনো ত্যাগ করতে পারেনি। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, জয়ানন্দের প্রত্যাবর্তনের পর পত্রের দ্বারা চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎ লাভের প্রস্তাবে চন্দ্রাবতীর মৌন সম্মতি ও ছোটবেলার স্বপ্নের কথা মনে পড়ার মধ্যে। যদিও পরক্ষণেই সে তার প্রেমের ব্যথাকে সংযত অন্তরের গভীরে পোষণ করেছে । তার আহত প্রেম কঠোর অভিমানের রূপ লাভ করেছে । এরপর মন্দিরের বাইরে জয়ানন্দের শেষবারের মতো পাগল -প্রায় চিৎকারও চন্দ্রাবতীর কাঠিন্যকে টলাতে পারেনি ।

এরপর জয়ানন্দকে সেখান থেকে ফিরে যেতে হয়েছে রিক্ত হৃদয়ে । এই প্রথম বোধহয় কোনো পুরুষকে উপেক্ষিত হয়ে ফিরে যেতে হল। আর চন্দ্রাবতীর এই আচরণে এক নারীর চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও অপরিসীম আত্ম -সংযমের প্রকাশ ঘটেছে বলা যায় । কিন্তু প্রেম যে সম্ভব -অসম্ভব, ধর্মনিষ্ঠা কোনো কিছুরই অধীন নয় , তা সম্পূর্ণ স্বাধীন; তা পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে নদীর জলে জয়ানন্দের মৃতদেহ দেখে চন্দ্রাবতীর অবস্থা বর্ণনায়-

"আঁখিতে পালক নাহি মুখে নাই সে বাণী।
বাড়িতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী।।"[১৪]

জয়ানন্দ তার ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে তাকে আঘাত দেওয়া সত্ত্বেও চন্দ্রাবতী শেষপর্যন্ত তার প্রণয়কে অটুট রেখেছিল। কিন্তু কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে-

"জয়ানন্দকে ভালবাসিয়া এই সাধ্বী ব্রাহ্মণললনা যে মর্ম্মন্তুদ কষ্ট পাইয়াছিলেন এবং সেই ঘোর পরীক্ষার আগুনে পুরিয়া তিনি কিরূপ বিশুদ্ধ সোনার ন্যায় নির্মল হইয়া উঠিয়াছিল ; তাহা এই গাথাটিতে বর্ণিত আছে।"[১৫]

একদিকে ধর্মত্যাগী ও প্রণয়ে বিশ্বাসহন্তা জয়ানন্দের প্রতি হৃদয়ের প্রবল আকর্ষণ আর অপরদিকে প্রেমের চরম অপমান চন্দ্রাবতীর জীবনে ট্রাজেডির করুণ পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছে। সে মহুয়ার মতো আত্মহত্যা হয়তো করেনি, সে প্রেমের জন্য জীবন্ত সমাধিতে পরিণত হয়েছে।

মহুয়া চন্দ্রাবতী চরিত্রের সক্রিয়তার দিক থেকে নিষ্প্রভ চরিত্র বলা যেতে পারে 'কঙ্ক ও লীলা ' গাথার নায়িকা লীলাকে। কিন্তু কঙ্কের প্রতি প্রেমের বেদনাকে ধারণ করে সে মহিমান্বিত হয়েছে । লীলা প্রসঙ্গে কেয়া চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য করেছেন—

> "লীলার আচরণ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমময়ী রাধার কথা মনে করিয়ে দেয় । কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী রাধার কৃষ্ণপ্রেম তাকে প্রেমিকা থেকে সা ধিকাতে রূপান্তরিত করেছিল। লীলার মধ্যেও বিরহ কাতর রাধার বেদনাবিধুর রূপটি প্রত্যক্ষ করি।"[১৬]

মাত্র আট বছর বয়সে মাতৃহীন হয়ে মাতৃহারা কঙ্কের হৃদয় বেদনাকে উপলব্ধি করে তার সাথে সখ্যতা স্থাপন করেছিল লীলা। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সখ্যতা পরিণত হয় গভীর প্রীতিবন্ধনে। কঙ্কের বাঁশি শুনে মুগ্ধ লীলা, কৈশোর ও যৌবনে কঙ্কের সান্নিধ্যে থেকে প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় বিভোর—

> "পথ নাহি দেখিরে বন্ধু ঝুরে আখি জলে।
> পাগলিনী হইয়া ফিরি তিলেক না দেখিলে।।"[১৭]

লীলার প্রণয় কিন্তু কোনোদিন কঙ্কের কাছে প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যক্ত হয়নি। বলা যেতে পারে, তার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ তারা দুজনেই একই গৃহে বড় হয়ে উঠেছে । তাই জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে লীলা কঙ্কের প্রতি তার গভীর প্রণয় ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়েছে—

> "না যাইও না যাইও বন্ধুরে আরে চরাইতে ধেনু।
> আতপে শুকাইয়া গেছেরে তোমার সোনার তনু।।
> আইস আইস বন্ধু খাওরে বাটার পান।
> তালের পাংখায় বাতাস করি জুড়াক রে পরাণ।।"[১৮]

প্রতিদিনের এইসব ছোট ছোট ঘটনাই আমাদের বুঝিয়ে দেয় কঙ্কের প্রতি লীলার আবেগের গভীরতা । কিন্তু লীলার প্রেমাকাশে দুর্ভাগ্য নেমে আসে। কিছু দূরভিসন্ধিপরায়ণ হিন্দু রটিয়ে দেয়, বেদাচারহীন, অধর্মচারী কঙ্ককে লীলা তার জীবন -যৌবন সমর্পণ করে বসেছে । গর্গ এই রটনায় বিভ্রান্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় প্রথমে কঙ্ককে মেরে পরে লীলাকে মারার। কিন্তু লীলা তা হতে দেয়নি । সে পিতার অভিসন্ধি বুঝতে পেরে কঙ্ককে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। কারণ প্রণয়ীকে বাঁচাতে সে বদ্ধপরিকর । এখানেই বোধহয় লীলা প্রমাণ করে দিয়েছে প্রেম স্বার্থকে পরার্থ করে । সে প্রণয়ীকে বাঁচার পরামর্শ দিয়েছে । কিন্তু নিজের প্রেমের মূল্য সে কি পেয়েছে ?

কঙ্কের অন্তর্ধানে সে তার শেষ অবলম্বনটি হারিয়ে উন্মাদিনীর মতো তাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। তার মনের ভার লাঘব করার মতো তার পাশে কেউ ছিল না সেদিন। তাই তাকে একা বসে কাঁদতে দেখি আমরা—

"সেইদিন হইতে লীলা ছাড়লো ভাত-পানি।
একেলা বসিয়া কান্দে দিবস-যামিনী।।"[১৯]

তার অসহায়তা আর ও প্রকট হয়ে উঠেছে কঙ্কের অন্বেষণে যাওয়া বিচিত্রমাধবের প্রত্যাবর্তনের পর লীলার অস্বাভাবিক বিচলিত অবস্থায় ছুটে যাওয়ার মধ্য দিয়ে । কিন্তু আমরা জানি, তাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে গৃহকোণে। কারণ কঙ্কের কোনো খোঁজ তারা পায়নি । এরপর লীলা তিন বছর কঙ্কের ফিরে আসার প্রতীক্ষা করেছে। হয়তো জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতো , কিন্তু জনরবে কঙ্কের মৃত্যু -সংবাদ শুনে তার ক্ষীণ আশাটুকুও নষ্ট হয়ে যায় । কঙ্ক ছাড়া লীলার কাছে জীবনের সব আকর্ষণ মিথ্যে তাই সময়ের আগে সে মৃত্যুযাত্রী হয়েছে। আর এই মৃত্যুর স্পর্শে সে কঙ্কের বিচ্ছেদ -বেদনার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে । বস্তুত লীলার প্রেম-জীবনে নিয়তির অভিশাপ লেগেছে। কারণ প্রেমে একনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও তার জীবনের ট্রাজিক পরিণতি নেমে এসেছে।

গীতিকার এই তিন নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পুথি আশ্রয়ী, দেবতা নির্ভর সাহিত্যের পাশে এই গ্রাম্য সাহিত্য এবং গ্রাম্য নায়িকাদের চরিত্র একটা বিচিত্র বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এই বিস্ময়ের কারণ হিসেবে বলতে পারি , এই নারীরা তাদের প্রেমের জন্য কোথাও কল্পনার সিঁড়ি ভাঙেনি। বরং তারা প্রেমের জন্য দুঃখে , ত্যাগে-তিতিক্ষায় হয়েছে অজেয়া। তাদের প্রেম সফলতার শিকড়ে পৌঁছাতে পারেনি। এই তিন নারী মহুয়া, চন্দ্রাবতী ও লীলা চরিত্রে একটি বিশেষ দিক হল — প্রেমের যে অসম্ভাবী পরিণতি বিবাহ, এই তিন নারী কিন্তু সমাজের পুরোহিতদের দ্বারা সেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেনি । কিন্তু তারা কি বধূবেশে কিঙ্কিণী বাজিয়ে বাসরঘরে যাত্রার স্বপ্ন দেখেনি ? বলতে পারি তাদের প্রেম নিশ্চয়ই প্রণয়ীর হাতে বরমাল্য পেতে চেয়েছিল। কিন্তু সে লগ্ন একান্তে বিলীন হয়ে গেছে। তারা প্রেমের জন্য হয়েছে সংগ্রামী তথা প্রতিবাদী। এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে তারা তাদের প্রেমে বাইরের ছায়া , বাইরের রেখা পড়তে দেয়নি । মহুয়া হুমরা বেদের চাপিয়ে দেওয়া বিয়ের পাত্র সুজন খেলওয়ারকে বিয়ে না করতে চেয়ে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে সমুচিত প্রতিবাদ করেছে। চন্দ্রাবতী জয়ানন্দের শত অনুরোধে মন্দিরের কপাট না খুলে বিশ্বাসঘাতক প্রেমিকের বিরুদ্ধে অভিমানের নীরব প্রতিবাদ করেছে আর গর্গ যখন লীলাকে কঙ্কের হাতে তুলে দেবে ভেবেছে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, লীলা তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমাজ ও পিতার নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ করেছে।

গীতিকার এই নারীরা বহু পূর্বে মধ্যযুগে শুধুমাত্র মানসিক নয় , শারীরিক ও মানসিক বীরত্বের পরিচয় দিয়ে বীর অঙ্গনার মহিমা লাভ করেছে একথা বাস্তবিকই সত্য বলা যায়। তাদের গুপ্ত প্রণয় ধর্ম, সমাজ ও সমাজ নির্দেশিত নীতির কাছে লাঞ্ছিত হয়েও তারা স্বতন্ত্রময়ী নারীরূপে নিজেদের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেন । তাদের

প্রেমের শক্তিতেই তারা নিজেদের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর জীবনে পদার্পণ করতে পেরেছে । এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তীর মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক—

> "পার্বতীর তুলনায় তাদের প্রেমের জন্য তপশ্চর্যা কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু হতভাগিনীরা শেষপর্যন্ত তাদের বহু অভি লাষিত প্রেমিককে লাভ করতে পারেনি । তাদের সমস্ত ত্যাগ , তিতিক্ষা, কৃচ্ছ্রসাধন ব্যর্থ হয়ে গেছে। তবে একথা সত্য যে, তারা স্মরণীয় হয়েছে, মহীয়সী রূপে আমাদের স্বীকৃতি লাভের অধিকারিনী হয়েছে।"[২০]

একথা সত্যি, মহুয়া চন্দ্রাবতী ও লীলা তিনজনের জী বনেই ট্রাজিক পরিণতি তাদের স্বাধীন প্রেম ও প্রেমের অধিকারের ক্ষেত্রটিকে অসহায় করে তুলেছে ঠিকই ; কিন্তু তাদের প্রেম এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যটি অপ্রাসঙ্গিক হবে না-

> "এই আগুনে পোড়া প্রেম ; এ প্রেম সুখের দাবি করে না , এ নিজে মুক্ত বলেই মুক্তি দেয় , এর পিছনে ক্লান্তি আসে না; ম্লানতা আসে না।– এর চেয়ে কি আর দেবার আছে।"[২১]

না পাওয়ার যে বেদনা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্রকে করুণ রসে আপ্লুত করেছে আলোচ্য তিন কুমারী মহুয়া, চন্দ্রাবতী ও লীলা চরিত্র বিশ্লেষণে তা আমাদের কাছে পরিস্ফুটিত হয়েছে । প্রেমের জন্য তাদের যে প্রাণ দান, সে প্রাণ এভাবেই অপূর্ব হয়ে উঠেছে। সমাজের পুরোহিতের সাধ্য ছিল না এই অপূর্বতা সৃষ্টি করার । কারণ তারা—

> "ইন্দুমতীর ন্যায় প্রেম পারিজাত স্পর্শে ইঁহারা প্রাণত্যাগ করিয়াও অমর হইয়াছেন । ইঁহারা কোন গৃহের সম্পর্কিত নহে ন, ইঁহারা পরস্পরের প্রতি উ দ্দাম অনুরাগ ভিন্ন অন্য কোন বিধি মানেন নাই,— প্রেম ভিন্ন ইঁহাদের ধর্ম্ম নাই,— পরস্পরের সাহচর্য্য ভিন্ন ইঁহারা কোন গৃহসুখ কল্পনা করেন নাই।"[২২]

একথা সত্য যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এভাবেই মহুয়ার প্রেমে একনিষ্ঠতা ও সাহসিকতা লীলার লীলা বসান এবং চন্দ্রাবতীর প্রগাঢ় ও প্রেম নিষ্ঠার জীবন্ত সমাধি তুলনাহীন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এই নারীরা সমাজের সমস্ত শাসন ও বাধাকে অতিক্রম করে প্রেমের জন্য প্রিয়জনের দিকে এগিয়ে গেছে আর তাদের প্রেমের পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছে বেদনা, মৃত্যু, কলঙ্ক ইত্যাদি । তাদের এই প্রেম -বেদনা-মৃত্যু তাদেরকে এভাবেই ব্যতিক্রমধর্মী প্রেম -সাধনায় কালজয়ী করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র:

১. চৌধুরী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা: ৪২১
২. তদেব, পৃষ্ঠা: ৪২১
৩. হক আজিজুল (সম্পা:), ময়মনসিংহ গীতিকা জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য, অবসর, ঢাকা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা: ৯৭

৪. সেন দীনেশচন্দ্র (সম্পা:), পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা: ১৪
৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫
৬. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৩
৭. তদেব, পৃষ্ঠা: ০৮
৮. তদেব, পৃষ্ঠা: ১০৬
৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩২
১০. তদেব, পৃষ্ঠা: ৪০
১১. তদেব, পৃষ্ঠা: ০৮
১২. তদেব, পৃষ্ঠা: ১০৭
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা: ১১৪
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা: ১১৬
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩২৯
১৬. চট্টোপাধ্যায় কেয়া (সম্পা:), মৈমনসিংহ গীতিকা: নব আলেখ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা: ১১৫
১৭. সেন দীনেশচন্দ্র (সম্পা:), তদেব, পৃষ্ঠা: ২৭৩
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা: ২৭৩
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩০৭
২০. চক্রবর্তী বরুণ (সম্পা:), গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ১৭৪
২১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা: ৩৭০
২২. সেন দীনেশচন্দ্র (সম্পা:), তদেব, পৃষ্ঠা: ২২